দ্বিতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগ (আঠারো ও উনিশ শতক)

Colonial Era (18th and 19th Century)

ঔপনিবেশিকতার রূপরেখা ও দ্বিমুখী শাসনকাল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন (১৭৫৭ - ১৮৫৭)

পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাংলায় শাসন ব্যবস্থা কুক্ষিগত করে কোম্পানি। শত বছর ধরে তারা একচেটিয়া বাণিজ্য, রাজস্ব আদায় কৌশল এবং রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। বহু নীতির ব্যর্থতা এবং অত্যাচারের ফলে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে ঐতিহাসিক সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যা কোম্পানি শাসনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।

সরাসরি ব্রিটিশ রাজ শক্তির শাসন (১৮৫৭ - ১৯৪৭)

১৮৫৭ সালের তীব্র বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে কোম্পানির ওপর আর এদেশের শাসনভার ন্যস্ত রাখা সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে সরাসরি ব্রিটিশ রাজপরিবারের হাতে সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা স্থানান্তরিত হয়। এই পর্যায়ে একদিকে শুরু হয় আধুনিক পাশ্চাত্য ধারার রাজনৈতিক সংগঠন গঠনের প্রক্রিয়া, অন্যদিকে বৃদ্ধি পায় স্বাধিকার চেতনা ও সাম্প্রদায়িক দূরত্ব।

কোম্পানি আমলের প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহ

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

১৭৬০-৬৩ খ্রিস্টাব্দে ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে সুফি ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের বিপ্লবী মোর্চা গঠিত হয়। নিজেদের অধিকার ও ধর্মীয় মর্যাদা সংরক্ষণে ইংরেজ কোম্পানি এবং তাদের মদদপুষ্ট জমিদারদের শোষণ রুখতে বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রাম চালানো হয়।

ফরায়েজি আন্দোলন

হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে ফরিদপুর, ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ইসলামী ফরজ আদায় ও শরিয়া অনুশাসন কায়েম। এটি একপর্যায়ে ব্রিটিশ শাসন বর্জনের জোরালো রূপ লাভ করে ইংরেজদের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ

১৭৮৩ সালে দিনাজপুরে অত্যাচারী দেবী সিংহের নৃশংস নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে সূচিত হয় কৃষক আন্দোলন। পরবর্তীতে পাবনাসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যায্য কর ও শোষণ প্রতিরোধ করা।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ : প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রথম মহান প্রতিরোধ ও ক্ষমতার পটপরিবর্তন

- **বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা** : ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের তুলনায় দেশীয় সিপাহিদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ও অপর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা হতো।
- **তীব্র অসন্তোষ** : ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত এবং বৈষম্যমূলক নীতির ফলে সিপাহিদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের রূপ নেয়।
- **ব্যাপক বিস্তার** : বিদ্রোহটি ঢাকা, ব্যারাকপুর, রংপুর অতিক্রম করে ভারতের কলকাতা, বারানসি, কানপুর ও দিল্লি পর্যন্ত বজ্রকণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে।
- **ঐতিহাসিক পরিণতি** : সশস্ত্র বিপ্লবের মুখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন চিরতরে রদ হয় এবং সরাসরি ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে।

চিত্র: স্যার অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম (পরবর্তীতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান উদ্যোক্তা)

জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও রাজনৈতিক সংগঠনের উত্থান

সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫)

ইউরোপীয় নবজাগরণের ধারায় ভারতীয়দের একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম উপহার দিতে স্যার অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে গঠিত হয় এই দল। এটি ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে যাত্রা করলেও কালক্রমে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোত্রীয় স্বার্থরক্ষার পথে পরিচালিত হয়, যা ১৯৪৭ সালের দেশভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সহ-উদ্যোক্তা: **নবাব ভিকার-উল-মুলক** (মুসলিম লীগের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা)

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (১৯০৬)

কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র হারানোর আশঙ্কা থেকে বঞ্চিত ভারতীয় মুসলমানরা ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর আমন্ত্রণে ১৯০৬ সালে একত্রিত হন। শিক্ষা সম্মেলন শেষে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এটি পরবর্তীতে ভারতীয় মুসলমানদের চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পাকিস্তানের জন্মের মূল ভিত্তি কায়েম করে।

মূল লক্ষ্য:

উপমহাদেশের পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পুনরুদ্ধার ও সমতা বিধান করা।

পলাশির যুদ্ধের পটভূমি ও কারণসমূহ

নবাব আলিবর্দী খান ও উত্তরসূরি

বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ইউরোপীয় বণিকদের আকৃষ্ট করে এবং ক্ষমতা বিস্তারে মনোনিবেশ করে। নবাব আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

অল্প বয়সে ক্ষমতা গ্রহণ এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে সিরাজউদ্দৌলা শুরু থেকেই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। পারিবারিক বিরোধ এবং রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা পলাশির যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

আদেশ অমান্য

নবাবের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে ইংরেজ গভর্নর ড্রেক সৌজন্য দেখাতে অস্বীকার করেন।

লাইসেন্সের অপব্যবহার

কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় দস্তক বা শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করতেন।

দুর্গ নির্মাণ

নবাবের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কলকাতায় ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার কাজ চালিয়ে যান।

ষড়যন্ত্রে মদদ

নবাবের প্রতিদ্বন্দ্বী শওকত জঙ্গকে ইংরেজরা সমর্থন দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে।

২৩ জুন ১৭৫৭: পলাশির প্রান্তর, যুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব

বিশ্বাসঘাতকতা: যুদ্ধের একপর্যায়ে নবাবের সেনাপতি মিরজাফর, রায়দুর্লভ ও ইয়ার লতিফ তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

মোহনলাল ও মিরমদন: নবাবের অনুগত এই দুই বীর সেনানী আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যান। মিরমদনের মৃত্যুর পর নবাব বিচলিত হয়ে পড়েন।

ভুল সিদ্ধান্ত: মিরজাফরের প্রতারণাপূর্ণ পরামর্শে নবাব সিরাজ যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেন, যা তার পরাজয় ও পতন নিশ্চিত করে।

- **স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান:** বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতনের পর মিরজাফর ক্রীড়নক নবাব হিসেবে অভিষিক্ত হন।
- **অর্থনৈতিক শোষণ:** কোম্পানি বাংলার রাজকোষ শূন্য করে ফেলে এবং বাণিজ্য ও রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।
- **বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪):** মীর কাসিমের পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার পরাধীনতার শৃঙ্খল পাকাপোক্ত হয়।
- **২০০ বছরের পরাধীনতা:** পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষ দীর্ঘ ২০০ বছরের জন্য ব্রিটিশদের উপনিবেশে পরিণত হয়।

বক্সারের যুদ্ধের প্রধান কারণসমূহ

বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ

ইংরেজদের শুল্কহীন বাণিজ্যের অপব্যবহার বন্ধে নবাব মীর কাসিম দেশীয় বণিকদের ওপর থেকেও শুল্ক তুলে নেন, যা ইংরেজদের ক্ষুব্ধ করে।

রাজধানী স্থানান্তর

ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত থাকার জন্য মীর কাসিম রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন।

মিত্রশক্তি গঠন

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের সাথে মীর কাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী মৈত্রীজোট গঠন করেন।

১৭৬৪: বক্সারের প্রান্তর

যুদ্ধের তারিখ: ২৩ অক্টোবর, ১৭৬৪।

নেতৃত্ব: ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতি হেক্টর মুনরো বনাম সম্মিলিত মিত্রশক্তি (মীর কাসিম, সুজাউদ্দৌলা ও শাহ আলম)।

ফলাফল: ইংরেজদের সুশৃঙ্খল সামরিক কৌশলের কাছে মিত্রশক্তি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মীর কাসিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন এবং বাংলার স্বাধীনতার সূর্য চূড়ান্তভাবে অস্তমিত হয়।

এলাহাবাদ চুক্তি (১৭৬৫): দেওয়ানি লাভ

পক্ষ	চুক্তির প্রধান শর্তাবলী
মুঘল সম্রাট শাহ আলম	কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) প্রদান করেন। বিনিময়ে সম্রাট বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা পান।
অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা	যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং এলাহাবাদ ও কারা জেলা ছেড়ে দেন।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়।

দ্বৈতশাসন: ক্ষমতার বিকৃতি

নবাবের দায়িত্ব

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচারকার্য ও প্রশাসনিক দায়িত্ব (নিযামত)। কিন্তু নবাবের হাতে কোনো অর্থ বা প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না।

কোম্পানির ক্ষমতা

রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ (দেওয়ানি)। কোম্পানির হাতে ছিল অগাধ অর্থ ও ক্ষমতা, কিন্তু জনগণের প্রতি কোনো দায়িত্ব ছিল না।

"নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, আর কোম্পানি লাভ করল দায়িত্বহীন ক্ষমতা।"

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ / ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ)

১ কোটি

মানুষের প্রাণহানি

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ: দ্বৈতশাসনের ফলে কোম্পানির নির্মম রাজস্ব আদায় এবং মজুতদারি নীতির কারণে বাংলায় এই মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ফলাফল: বাংলার জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করে। কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং জনপদ জনমানবহীন মরুভূমিতে পরিণত হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংস ও রাজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা (১৭৭২-১৭৮৯)

দ্বৈতশাসনের অবসান: ১৭৭২ সালে গভর্নর নিযুক্ত হয়েই হেস্টিংস রেজা খান ও সেতাব রায়ের নায়েব দেওয়ান পদ বিলুপ্ত করে দ্বৈতশাসন বাতিল করেন। রাজস্ব আদায়ের ভার সরাসরি ইংরেজ 'কালেক্টর'দের হাতে ন্যস্ত হয়।

বোর্ড অব রেভিনিউ: রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এই উচ্চতর বোর্ড এবং স্থানীয় নীতিনির্ধারণের জন্য 'কমিটি অব সার্কিট' গঠন করা হয়।

প্রশাসনিক রূপান্তর

- সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারীকে ৫ বছরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া শুরু হয়।
- দুর্নীতি বৃদ্ধির কারণে পরবর্তীতে কালেক্টর পদ সাময়িক বিলুপ্ত করে ৬টি প্রাদেশিক কাউন্সিল তৈরি হয়।
- ১৭৭৭ সালে পাঁচসালা ব্যর্থ হলে **একসালা (বাৎসরিক) বন্দোবস্ত** চালু হয়, যা ১৭৮৯ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

ভূমি সংস্কারের বিবর্তন ক্রমনীতি

১ পাঁচসালা বন্দোবস্ত

১৭৭২ – ১৭৭৭

সর্বোচ্চ নিলামকারীকে ৫ বছরের জন্য জমি দান। অতিরিক্ত আবওয়াব ও নজর-সেলামি নিষিদ্ধকরণ।

২ একসালা বন্দোবস্ত

১৭৭৭ – ১৭৮৯

বাৎসরিক ভিত্তিতে ভূমি ইজারা প্রথা। ক্ষণস্থায়ী মেয়াদের কারণে সরকার, জমিদার ও কৃষক সবার ক্ষতি।

৩ দশসালা বন্দোবস্ত

১৭৯০ – ১৭৯২

লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক জমিদারদের সাথে ১০ বছরের চুক্তি, যা পরবর্তীতে স্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি ছিল।

৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

১৭৯৩ (২২ মার্চ)

ডাইরেক্টরস সভার অনুমোদনে কর্নওয়ালিস কর্তৃক জমিদারদের ভূমির চিরস্থায়ী মালিকানা দান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

রাজস্ব সুনির্দিষ্টকরণ

পূর্ববর্তী অস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিশ্চয়তা দূর করে কোম্পানির বার্ষিক আয়কে একটি নির্দিষ্ট ও স্থায়ী অঙ্কে বেঁধে ফেলা, যা বাজেট প্রণয়ন সহজ করে।

অনুগত শ্রেণি তৈরি

জমির স্থায়ী মালিকানা দেওয়ার মাধ্যমে এদেশীয় প্রভাবশালী ও বিত্তশালী জমিদারদের ব্রিটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক ও স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলা।

কৃষি ও বাজার উন্নয়ন

মালিকানা স্থায়ী হলে জমিদাররা পতিত জমি উদ্ধার ও উৎপাদনে মনোযোগ দেবে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নত হবে এবং ব্রিটেনের পণ্যের বাজার তৈরি হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সূর্যাস্ত আইন

আইনি বৈশিষ্ট্য	বাস্তব কার্যকারিতা ও শর্তাবলী
জমির পূর্ণ মালিকানা	জমিদারদের বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য মালিকানা দান। বিচার ও পুলিশি ক্ষমতা জমিদারদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়।
খাজনা ও পাট্টা প্রথা	জমিদারদের বার্ষিক ১২ কিস্তিতে নির্দিষ্ট কর দিতে হতো। প্রজাদের জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে 'পাট্টা' দেওয়ার নির্দেশ ছিল।
সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law)	**বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে সরকারি রাজস্ব জমা দিতে ব্যর্থ হলে** জমিদারি নিলামে তুলে বিক্রি করে দেওয়া হতো। এর ফলে ২৫ বছরের মধ্যে অর্ধেক প্রাচীন জমিদারি হাতবদল হয়ে যায়।

দ্বিমুখী প্রভাব: কোম্পানির লাভ বনাম বাংলার ক্ষতি

কোম্পানির সুফল ও জমিদারদের লাভ

- **বাজেট নিশ্চয়তা:** কোম্পানি স্থায়ী আয় নিশ্চিত করে বড় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও যুদ্ধের ব্যয় মেলাতে সক্ষম হয়।
- **জমিদারদের আয় বৃদ্ধি:** ১৭৯৩ সালে জমিদারদের মোট খাজনা যেখানে ৩ কোটি টাকা ছিল, ১৮৭৬ সালে তা বেড়ে ১৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অতিরিক্ত লাভ পুরোটাই জমিদারদের পকেটে যায়।
- **উৎপাদন বৃদ্ধি:** অনাবাদি ও জঙ্গল ঘেরা জমি চাষের আওতায় আসে।

কৃষক ও মুসলিম সমাজের চূড়ান্ত বিপর্যয়

- **মালিকানা হরণ:** সাধারণ কৃষকেরা শতাব্দী প্রাচীন ভূমির স্বত্ব হারিয়ে জমিদারের দয়ার ওপর নির্ভরশীল দিনমজুরে পরিণত হয়।
- **রাজস্বের বিপুল চাপ:** ১৭৬৫ সালে কোম্পানির রাজস্ব যেখানে ১.৬ কোটি টাকা ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে **৩.১৭ কোটি টাকায়** পৌঁছায়।
- **মুসলিম অভিজাতদের পতন:** লাখেরাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় বহু মুসলিম জমিদার ধ্বংস হয় এবং অবৈতনিক মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

লর্ড ওয়েলেসলির সাম্রাজ্য বিস্তার কৌশল

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হয়ে লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে আগমন করেন। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এক শাসক। তিনি পূর্ববর্তী শাসক জন শোরের নিরপেক্ষ নীতি সম্পূর্ণ পরিহার করেন।

নীতির মূল উদ্দেশ্য

দেশীয় রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশদের ওপর সামরিকভাবে নির্ভরশীল করে তোলার মাধ্যমে ভারতীয় রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ ও ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা।

এই ব্যবস্থার অধীনে মিত্রতাবদ্ধ দেশীয় শাসকরা মূলত তাদের সার্বভৌমত্ব কোম্পানির চরণে সমর্পণ করতে বাধ্য হতেন।

লর্ড রিচার্ড ওয়েলেসলি (গভর্নর জেনারেল: ১৭৯৮-১৮০৫)

মিত্রতা নীতির ৪টি কঠোর শর্তাবলী

পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ

মিত্রতায় আবদ্ধ কোনো ভারতীয় রাজা ইংরেজ সরকারের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, চুক্তি বা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে পারবেন না।

ইংরেজ সৈন্য পোষণ

নীতিতে আবদ্ধ রাজ্যগুলোকে নিজেদের ভূখণ্ডে একদল স্থায়ী ইংরেজ সৈন্য দল লালন-পালন করতে হবে এবং তার যাবতীয় ব্যয়ভার ওই রাজ্যকেই বহন করতে হবে।

ইউরোপীয়দের বহিষ্কার

মিত্রতাবদ্ধ দেশীয় রাজ্যসমূহ থেকে একমাত্র ইংরেজ ব্যতীত অপর সব ইউরোপীয় কর্মচারী, পরামর্শদাতা ও নাগরিকদের অবিলম্বে চাকুরিচ্যুত করে বিতাড়িত করতে হবে।

কোম্পানির নিরাপত্তা

উপরোক্ত সকল শর্ত সফলভাবে পালন করার বিনিময়ে মিত্রতায় আবদ্ধ রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্ত নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহন করবে।

"এই নীতি রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে শুরু হলেও লর্ড ওয়েলেসলি একে চূড়ান্ত ও সুসংগঠিত রূপ দান করেন।"

স্বত্ববিলোপ নীতি

লর্ড ডালহৌসির উগ্র সাম্রাজ্যবাদী রূপ

১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসির শাসনামলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চরম সীমায় পৌঁছায়। তার প্রধানতম আগ্রাসী হাতিয়ার ছিল 'স্বত্ববিলোপ নীতি' বা 'Doctrine of Lapse'।

নীতির মূল কথা ও দত্তক প্রথা রদ

কোনো আশ্রিত দেশীয় রাজার যদি নিজস্ব আইনসংগত উত্তরাধিকার (পুত্র) না থাকে, তবে তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। রাজাদের সনাতন "দত্তকপুত্র গ্রহণ" প্রথা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়।

ব্যতিক্রম: পূর্বে ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতায় সৃষ্ট রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযুক্ত হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

লর্ড ডালহৌসি (গভর্নর জেনারেল: (১৮৪৮-১৮৫৬)

বাংলার নবজাগরণ

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে আধুনিক চিন্তায় রূপান্তর

ল্যাটিন শব্দ Rinascere থেকে রেনেসাঁ বা পুনর্জন্ম শব্দটির উৎপত্তি। উনিশ ও বিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে ও ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে যে বুদ্ধিভিত্তিক জাগরণ ঘটে, তাকেই **বাংলার নবজাগরণ** বলা হয়।

- **মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদ**: মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং সংকীর্ণতার অবসান ঘটিয়ে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার সূচনা ঘটে।
- **ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি**: মানুষের মেধা ও চিন্তার স্বাধীনতা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটে।
- **অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়**: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলেই রামমোহন রায়ের হাত ধরে এই জাগরণের সূচনা হয় এবং পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে তা পূর্ণতা লাভ করে।

বাংলার নবজাগরণের মূল বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক সংস্কার

সংস্কারের ক্ষেত্র	কার্যক্রম ও প্রভাব	প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মনীষী
সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণ	সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয়। দীর্ঘকাল পর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ আইনি স্বীকৃতি লাভ করে।	রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কার	ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মাধ্যমে 'ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন' গড়ে ওঠে।	হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, নবাব আবদুল লতিফ
সাহিত্যে নবযুগ	পাশ্চাত্য রীতির সাথে বাংলা ভাষার মেলবন্ধন ঘটিয়ে নাটক, সনেট, উপন্যাস ও আধুনিক বাংলা গদ্যের স্বর্ণযুগ শুরু হয়।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সংবাদপত্রের প্রসার	১৭৮০ সালে 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের পর স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনার দরজা উন্মুক্ত হয়।	জেমস অগাস্টাস হিকি ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারক
জাতীয়তাবাদের উদ্ভব	শিক্ষা ও সামাজিক ঐক্যবোধের প্রভাবে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়।	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

** নবজাগরণের শিক্ষা তৎকালীন ভারতীয়দের মনে বৈষম্যমূলক "কালো আইন" (ইউরোপীয় বিবাদীদের বিচার করতে না পারার আইন) রদ করার লড়াইয়ে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছিল।*

নবজাগরণের প্রেক্ষাপট ও সূচনা

ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবে উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তাই বাংলার নবজাগরণ।

- **যুক্তি ও বিজ্ঞান**: অন্ধবিশ্বাস সরিয়ে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার বিকাশ।
- **মধ্যবিত্ত শ্রেণি**: এই জাগরণের মূল অংশীদার ও নেতৃত্বদানকারী ছিল উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজ।
- **পাশ্চাত্য প্রভাব**: ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি।

সমাজ সংস্কারের প্রধান পথিকৃৎ

রাজা রামমোহন রায়

সতীদাহ প্রথা বিলোপ, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং একেশ্বরবাদ প্রচারের মাধ্যমে আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারী শিক্ষা প্রসারে আমৃত্যু লড়াই করেছেন। তিনি বাংলা গদ্যের জনক।

নবাব আবদুল লতিফ

'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'র মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিকতার প্রচার করেন।

হেনরি লুইস ডেরোজিও

'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে যুক্তিবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন।

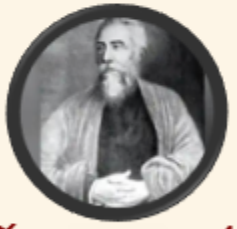

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা ও শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখেন এবং শান্তিনিকেতনের ভিত্তি গড়েন।

সৈয়দ আমির আলি

'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করে মুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার জন্ম দেন।

নবজাগরণের বহুমুখী প্রভাব

মানব কল্যাণ

সতীদাহ বিলোপ ও বিধবাবিবাহের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুপ্রথা দূরীকরণ।

মুক্তচিন্তা ও যুক্তি

অন্ধবিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞানমনস্ক ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে।

জাতীয়তাবাদ

রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় যা পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াইকে বেগবান করে।

শিক্ষা ও সাহিত্যের নবদিগন্ত

নবজাগরণের প্রভাবে বাংলায় নতুন ধারার শিক্ষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়:

- **পাশ্চাত্য শিক্ষা:** ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বদলে আধুনিক ও বিজ্ঞানমুখী ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার।
- **সাহিত্যের নতুন শৈলী:** নাটক, উপন্যাস, গদ্য ও ছোটগল্পের মাধ্যমে আধুনিক সমাজ চিত্রায়ণ।
- **সংবাদপত্র:** জনমত গঠনে সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার

সতীদাহ প্রথা রোধ

১৮২৯ সালে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই জঘন্য প্রথা নিষিদ্ধ হয়।

নারীমুক্তি আন্দোলন

নারীনির্যাতন শাস্ত্রবিরোধী বলে তিনি প্রচার চালান এবং অধিকার রক্ষা করেন।

সামাজিক সমতা

জাতিভেদ ও কৌলীন্য প্রথার বিরোধিতা করে সামাজিক ভারসাম্য আনেন।

"তাঁকে বাংলার সমাজসংস্কারের জনক বলা হয়।"

শিক্ষা সংস্কার ও আধুনিকায়ন

পাশ্চাত্য ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার

- **১৮২২:** অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা।
- **১৮২৬:** বেদান্ত কলেজ স্থাপন।
- পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ।
- নারী শিক্ষার সপক্ষে শক্তিশালী জনমত সৃষ্টি।
- 'ব্রাহ্মণ সেবক' ও 'মিশনারি সংবাদ' পত্রিকা প্রকাশ।

বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার

বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ করা।

- **১৮৫৫**: বিধবাবিবাহের সমর্থনে আবেদন পেশ।
- **১৮৫৬**: বিধবাবিবাহ আইন (Act XV) পাস।
- নিজ পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিধবা বিবাহ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন।
- ব্যক্তিগত ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েও সমাজ সংস্কার অব্যাহত রাখেন।

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন

পরিচিতি ও মূল ভিত্তি

উনিশ শতকে কলকাতার হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল শিক্ষক **হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর** অনুসারী একদল অত্যন্ত মেধাবী বাঙালি ছাত্র ঐতিহ্যবাহী কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হন। তাঁদের "ইয়ং বেঙ্গল" বা "ডিরোজিয়ান" বলা হতো। এরা ইউরোপীয় রেনেসাঁর নব আলোকবর্তিকা বুকে ধারণ করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন।

একাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮)

মুক্তচিন্তা ও বিতর্কের বিকাশ ঘটাতে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এই বুদ্ধিবৃত্তিক ফোরাম গঠন করেন। এই সভায় সামাজিক প্রথা, সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও তীব্র তর্ক-বিতর্ক হতো, যা তরুণদের স্বাধীনভাবে ভাবতে এবং ধর্মান্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে শেখাত।

আন্দোলনের ফলাফল ও ডিরোজিওর অকাল প্রয়াণ

তীব্র সংস্কার আন্দোলনের জবাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ প্রচণ্ড রুষ্ট হয় এবং কলেজের চাপের মুখে ডিরোজিও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৮৩১ সালের ২৬ ডিসেম্বর মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর পর আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থিমিত হয়ে পড়লেও এটিই পরবর্তীতে বাংলার আধুনিক মনস্তত্ত্বের মূল ভিত্তি গড়ে দেয়।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯ - ১৮৩১)

প্রধান সক্রিয় সদস্যবৃন্দ:

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাত শিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিকায়ন ও নতুন ধারা

মধ্যযুগীয় ধারার অবসান

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য যেখানে দেব-দেবী ও অতিপ্রাকৃতিক ধর্মাশ্রয়ী উপাখ্যানে সীমাবদ্ধ ছিল, উনিশ শতকে এসে সেখানে মানুষের পার্থিব সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বাস্তব জীবন মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে।

আধুনিক গদ্যরীতির সূচনা

রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ হাত ধরে বাংলা গদ্যের সুষ্ঠু কাঠামো তৈরি হয়। দেবভাষার প্রভাবমুক্ত হয়ে গদ্য হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ভাব প্রকাশের শক্তিশালী হাতিয়ার।

নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ও সামাজিক সচেতনতা

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য থিয়েটারের আদলে আধুনিক সামাজিক নাটক লেখা শুরু হয়। জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে ১৮৭২ সালে মঞ্চস্থ হয় দীনবন্ধু মিত্রের কালজয়ী নাটক **নীলদর্পণ**। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তন করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও রেনেসাঁস উত্তর আধুনিক নাট্যশৈলী।

জাতীয়তাবাদ ও বিদ্রোহী চেতনা (নজরুলের যুগ)

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কাজী নজরুল ইসলামের ধুমকেতুর ন্যায় আগমন ঘটে। তাঁর সাম্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল কবিতা ও গান ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের ভিত্তি কাঁপিয়ে দেয় এবং শৃঙ্খলমুক্ত সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)

সাহিত্যের আন্তর্জাতিকীকরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত হয়। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাট্যসাহিত্যে আধুনিক রূপায়নের মাধ্যমে তিনি এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন এবং ১৯১৩ সালে **'গীতাঞ্জলী'** কাব্যগ্রন্থের জন্য এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পান।

বাঙালি সংস্কৃতির রূপান্তর ও সমাজ সংস্কার

শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর

মধ্যযুগের সংকীর্ণ টোল ও মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষা কাঠামোর স্থলে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় প্রসারিত হয় এবং যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়।

সামাজিক ও বর্ণপ্রথা সংস্কার

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথা দুর্বল হতে থাকে। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথার বিলোপ এবং ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহের আইনি স্বীকৃতি লাভ হয়। নারী মুক্তি ও প্রসারের এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়।

নগরায়ন ও ভাষা-সংস্কৃতি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির স্থলে আধুনিক কলকাতা-কেন্দ্রিক শহুরে নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ইংরেজি ভাষার প্রভাবে একটি নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক এলিট শ্রেণির উত্থান ঘটে, যা দেশীয় কৃষ্টিকে অবহেলা না করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগান্তকারী আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করে।

শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংগীত ও ধর্মে আধুনিকতা

চিত্রকলা: বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট

পাশ্চাত্য রীতির ব্যাপক প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনে বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য শিল্পীরা দেশীয় চিত্রকলার সাথে জাপানি ও পশ্চিমা কৌশল সংমিশ্রিত করে একটি সার্থক ও সার্বভৌম ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা ধারা তৈরি করেন।

সংগীতের আধুনিকায়ন

নিধু গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরবর্তীতে কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্দীন প্রাচীন ধর্মীয় সংকীর্ণতা ভেঙে আধ্যাত্মিক সুফি ভাব ও পাশ্চাত্য মেলোডির সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলা সংগীতকে এক অভূতপূর্ব কাব্যিক ও আধুনিক উচ্চতায় নিয়ে যান।

ধর্মীয় সংস্কার ও ঐতিহ্য

ব্রিটিশদের "ভাগ কর শাসন কর" নীতির কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দূরত্ব বাড়লেও স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চরম ঐক্য বজায় ছিল। ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যান্য সংস্কারবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারসমূহ দুর্বল হয় এবং মুসলিম সমাজেও ক্রমশ আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে থাকে।

উনিশ শতকের ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলী

স্থাপত্যে ইন্দো-ইউরোপীয় মেলবন্ধন

কলকাতার হাইকোর্ট ভবন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এবং হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নির্মাণে স্থানীয় কারিগরি বিশ্বাসের সাথে ইতালীয় ও ব্রিটিশ রীতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এটি ঔপনিবেশিক যুগের স্থাপত্যকে একটি অনন্য রাজকীয় রূপ প্রদান করেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার পটভূমি

লর্ড মেকলের শিক্ষানীতি ও উদ্দেশ্য (১৮৩৫)

> *"এমন একদল ব্যক্তি সৃষ্টি করা, যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।"*

প্রশাসনিক প্রয়োজন: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে ইংরেজি জানা নির্ভরযোগ্য দেশীয় কর্মচারী প্রস্তুত করা।

সাংস্কৃতিক আধিপত্য: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 'নরম শক্তি' (ঋড়ভঃ চড়ব্বিং) ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের মানসিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার: সতীদাহ প্রথার মতো প্রাচীন কুসংস্কার নির্মূলের হাতিয়ার হিসেবে পাশ্চাত্য জ্ঞান ব্যবহার।

শিক্ষা বিস্তার ও প্রতিষ্ঠান

১৮৩৫ সালের শিক্ষানীতি

লর্ড মেকলের প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে সরকার ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে অর্থায়ন নিশ্চিত করে। এর ফলে-

- প্রাচ্যবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ হ্রাস পায় এবং ইংরেজি আধুনিক শিক্ষায় তহবিল বৃদ্ধি করা হয়।
- সরকারি সাহায্য বৃদ্ধির ফলে খুব দ্রুত দেশজুড়ে নতুন ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।
- শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানার্জন নয়, বরং একটি সুসংগঠিত প্রশাসনিক জনবল সৃষ্টিতে রূপ নেয়।

প্রতিষ্ঠান ও মিশনারিদের ভূমিকা

পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা ছড়িয়ে দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান ছিল যুগান্তকারী:

- **হিন্দু কলেজ (১৮১৭):** যা পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিত হয় এবং আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
- **তিন বড় বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭):** ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হয়।
- **মিশনারিদের কার্যক্রম:** সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় ইংরেজি, দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান এবং যৌক্তিক নৈতিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।

নেতাদের দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি

রক্ষণশীল ধারা (অনীহা ও প্রতিরোধ)

পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ইসলামি ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও শরিয়াহভিত্তিক জীবনের জন্য সরাসরি হুমকি মনে করেছিলেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (১৭৪৬-১৮২৪)

ইংরেজি শিক্ষা কুরআন-সুন্নাহ থেকে যুব সমাজকে বিচ্যুত করবে এই আশঙ্কায় সতর্কীকরণ ফতোয়া প্রদান করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়া

ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বের প্রতীক হিসেবে বর্জন করার ডাক দেন।

শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল (১৭৭৯-১৮৩১)

মধ্যপন্থা নীতি অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক উপযোগিতাকে স্বীকার করলেও নৈতিকতা হারানোর ব্যাপারে তীব্র শঙ্কিত ছিলেন।

প্রগতিশীল ধারা (পুনর্জাগরণ ও সংস্কার)

উপলব্ধি করেন যে আধুনিক জ্ঞান ও ইংরেজি ব্যতীত মুসলিমদের ভাগ্য পরিবর্তন বা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা অসম্ভব।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)

আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন।

নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

কলকাতা মুসলিম লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে বাংলার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার মূলধারায় নিয়ে আসেন।

বেগম রোকেয়া ও খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের (১৯১১) মাধ্যমে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসার ও মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিকায়নে অবদান রাখেন।

মুসলিম সমাজে শিক্ষার বহুমুখী প্রভাব

চাকরি ও অর্থনৈতিক সুযোগ

ইংরেজি ও আধুনিক বিজ্ঞান গ্রহণের পর শিক্ষিত মুসলমানরা সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে থাকে। এর ফলে দীর্ঘদিন যাবত হিন্দু সমাজের একচেটিয়া প্রভাব ভেঙে কৃষিভিত্তিক জীবনের বাইরে একটি মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের উদ্ভব ঘটে।

সামাজিক ও নারী প্রগতি

বেগম রোকেয়ার হাত ধরে দীর্ঘদিনের বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধত্বকে পেছনে ফেলে নারীদের শিক্ষার সূচনা হয়। বিজ্ঞানমনস্কতা ও যৌক্তিক চিন্তাধারা মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারমূলক কাজকে ত্বরান্বিত করে তোলে।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ

পাশ্চাত্য রাজনীতির জ্ঞান মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলন ও আধুনিক জাতীয়তাবাদ বুঝতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে শিক্ষিত যুব সমাজ গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানের আন্দোলনের বীজ বপন করে।